PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-14, No.-2, November 2023

‘সওদাগর’ চলচ্চিত্রে শিউলি জাতির জীবন আলেখ্য

দীপঙ্কর নস্কর[1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান
ই-মেইলঃ naskar.dipankar8@gmail.com.

সংক্ষিপ্তসার

ভারতীয় চলচ্চিত্র হল পরম্পরাগত দেশজ সমাজ জীবনের বহু সাদা-কালো, রঙিন বর্ণবিচিত্র রামধনু। যেখানে বাস্তব, কল্পনা, মিথ বহু রঙের গল্পের সমাবেশ এর বিচিত্র বিষয় বিস্তৃতিকে প্রতিচিত্রিত করে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহু বৈচিত্র উপদানই বহুমাত্রিক। অর্থাৎ এক একটি সুনির্দিষ্ট উপাদান একাধারে ট্রাজেডি, কমেডি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, কৌতুক, ব্যাঙ্গাত্মক, রোমান্স, ষড়যন্ত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, আর্থ-সামাজিক চিত্র ইত্যাদি বহুক্ষেত্রের সমন্বয়। আমরা দেখেছি কিছু বিশ্বখ্যাত বাঙালি পরিচালকের হাত ধরে তাদের বুদ্ধিবিভাসা ও আলোকদীপ্ত চিন্তনে ভারতীয় হিন্দি-বাংলা চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের জীবন আলেখ্য। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ ‘অপরাজিত’, মৃণাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’, ‘পদাতিক’, ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ‘নাগরিক’, তরুণ মজুমদারের ‘নিমন্ত্রন’, ‘আলো’, তপন সিংহের ‘অতিথি’, ‘কাবুলিওয়ালা’ প্রভৃতি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বাঙালি সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’ গল্পটির মধ্যে দিয়ে শিউলি সমাজের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে; অনবদ্য এই সাহিত্য সৃষ্টিকে ১৯৭৩ সালে হিন্দিতে ‘সওদাগর’ (অমিতাভ বচ্চন, নূতন ও পদ্মা খান্না) নামক কালজয়ী চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেছিলেন বাঙালি পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জী। খেজুর রস থেকে গুড় তৈরি এক লোকশিল্প কর্ম, তা সকলের দ্বারা অসম্ভব। এর জন্য ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় ও শৈল্পিক দক্ষতা প্রয়োজন। এই কাহিনীর মূল বিষয় প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন চিত্রে দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও শৈল্পিক দক্ষতাকে ঘিরেই আবর্তিত। মূল প্রবন্ধের গভীরে বিশ্লেষিত হয়েছে চলচিত্র ও বাস্তব জীবনের সমাজতাত্ত্বিক প্রতিচ্ছবি।

সূচক শব্দ: চলচিত্র, বাস্তবতা, জীবন সংগ্রাম, শিউলি জাতি, অস্তিত্বের সংকট

‘সওদাগর’ চলচ্চিত্রের প্রধান উপজীব্য ছিল শিউলি জাতির সংস্কৃতি, শিল্প, দক্ষতা, ধৈর্য্য, অধ্যাবসায় ও জীবন সংগ্রাম। আমার মূল প্রবন্ধের বিষয় সমাজের অন্ত্যজ প্রান্তিক শ্রেণী চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছিল দক্ষ কলা-কুশলীদের সুদক্ষ ও আন্তরিক অভিনয়ের মাধ্যমে। কিভাবে হিন্দি চলচ্চিত্রে লোকায়ত প্রান্তিক পেশাজীবী শিউলি গ্রাম্য জীবনে কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিনাতিপাত করে, সেখানে দারিদ্যের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা ও আখাঙ্খা ফুটে ওঠে তার জীবন্ত বাস্তব চিত্র পরিচালক দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার বাস্তব অন্বেষণ ও চলচ্চিত্রের পর্দায় ফুটিয়ে তোলা

চিত্র কিভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তার প্রেক্ষণ তুলে ধরার আন্তরিক প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

নিম্নগাঙ্গেয় প্রান্তিক বা অন্ত্যজ শ্রেণীর ইতিহাসের একটি দিকচিহ্ন হল লোকসংস্কৃতি, লোকশিল্প, লোকাচার, মৌখিক ভাষ্য, ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি অনেক জনজাতি ও নিম্নবর্গীয় মানুষ জনের নিজস্ব লিখিত ইতিহাস সাধারণত থাকে না, আর তাদের ইতিহাসে যদি আমাদের আগ্রহ থাকে তাহলে তা খুঁজতে হবে অন্ত্যজ শ্রেণীর কৃষ্টি, লোকশিল্প, লোকাচার ও মৌখিক ভাষ্য ঐতিহ্যে। পাশাপাশি তাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে অনুসন্ধান ও ক্ষেত্রসমীক্ষা করে খুঁজে নিতে হয় ঐতিহাসিক উপাদান ও তথ্য। এক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটি ছিল একটি আকর উপাদান। পরিচালক যার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন 'সওদাগর' চলচ্চিত্রের রসদ। ঐতিহাসিক ডি ডি কোসাম্বির মতে, "যে আচার বা মেধাশক্তি পুরাণ আদিকাল থেকে এখনো বর্তমান, তার মর্মেই খুঁজতে হবে সভ্যতার শিকড়"।[১] দেবীপ্রসাদ চট্টপাধ্যায়ের মতে, "অগ্রণী সভ্যতার পাশাপাশি টিকে থাকে প্রাচীন কিছু উপাদান (হস্তশিল্প ও প্রযুক্তি), ভারতের অসম বিকাশের এটি একটি দিক চিহ্ন"।[২]

প্রান্তিক শিউলি সমাজের সাথে গুড়, পাটালি বারবার বাংলা সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে উঠেছে, তার হিসাব নেই। কতভাবে জীবন ও মরণের রূপক জুগিয়েছে এই সমাজ তাঁর একাংশ উল্লেখ করাও অসম্ভব। সেই সাহিত্যের আঙিনা থেকে চলচ্চিত্রে বিশেষ প্রবেশ সত্যিই রোমাঞ্চকর। তাই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় চলচ্চিত্রের সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা অতি প্রয়োজন, যা প্রবন্ধকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। চলচ্চিত্রে শিউলি চরিত্রে 'অমিতাভ বচ্চন' ওরফে মোতালেফ মিয়াঁ(মতি); দক্ষ গুনসম্পন্না গুড়-পাটালি লোকশিল্পী 'নতুন' ওরফে মাঝুবি, যিনি মতির প্রথম স্ত্রী এবং মতির দ্বিতীয় স্ত্রী রূপশ্রী 'পদ্মা' ওরফে ফুলবানু, যিনি 'রস-গুড়-পাটালি' শিল্পে একেবারে অনভিজ্ঞ।

সংস্কৃত 'খর্জুর' সাধু ভাষাজাত শব্দ। চলতি বা কথ্য ভাষায় বলা হয় খেজুর। হিন্দি, মারাঠি, অসমীয়া ভাষায় খেজুর গাছকে 'খজর' গাছ বলে। এর বিজ্ঞান সম্মত নাম 'Phoenix Sylvestris'।[৩] মানব জাতি খেজুর গাছ থেকে প্রথম মিষ্টি রসের সন্ধান পেয়েছিল, কখন, কোথায়, কিভাবে তার কোনও ঐতিহাসিক প্রামান্য তথ্য নেই। তবে অনুমিত যে, পুরাকালের প্রাক্কালে মানুষ জীবন-জীবিকার তাগিদে খুঁজে পেয়েছিল সরস প্রাকৃতিক বৃক্ষ সম্পদ খেজুর গাছকে। খেজুর গাছের পরিপক্ক ফল তাদের উদরের ক্ষুধা নিবৃতি করেছিল। তাদের অন্বেষা মনের কাছে এই গাছ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে এবং কাটা-ছেঁড়া করতে গিয়ে গাছের অগ্রভাগের কোমল ও নরম অংশ থেকে পেয়েছিল বিশ্বের সুমধুর রস ভাণ্ডার। জন্মের পর শিশু যেমন মায়ের বক্ষে খুঁজে পায় স্বর্গীয় অমৃত সুধা, যা তাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচতে সাহায্য করে, ঠিক তেমন আদিম মানব সমাজ তাদের বেঁচে থাকার অন্যতম রসদ রূপে পেয়েছিল অমৃত কুম্ভ খেজুর বৃক্ষকে।

বঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ খেজুর গাছের (Date Palm) শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী এই ভূমিভাগের দক্ষিণাংশে অসংখ্য খেজুর গাছ যত্র-তত্র প্রকৃতির বুকে জন্মায়। এখানকার লবণাক্ত মাটি, জলবায়ু, আবহাওয়া ভালো মানের খেজুর গাছের পক্ষে সহায়ক। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ুর বিভিন্ন অঞ্চলেও এই গাছের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নগাঙ্গেয় প্রাকৃতিক পরিবেশে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রের

'আল' বরাবর বা জলাশয়ের পাড় বা জমির চারপাশে খেজুর গাছ সারিসারি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে এই অতিপরিচিত প্রান্তিক গ্রামীণ চিত্র নিখুঁতভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করে পরিচালক বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত উপকারি এই পাম জাতীয় গাছ শিউলি সমাজের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন লোকাচারের সাথে সম্পৃক্ত। লোকজীবনে খেজুর রস থেকে সৃষ্ট খেজুর গুড়, বিশ্ববন্দিত 'নলেন গুড়' নামে প্রসিদ্ধ। 'গুড়' একটি সংস্কৃত শব্দ হলেও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাতেও 'গুড়' বলেই উচ্চারিত। পাশাপাশি খেজুর রস গেঁজিয়ে তৈরি মাদক 'তাড়ি' পানীয় হিসেবে লোকসমাজে সমাদৃত।

গ্রামীণ সমাজে দৈনন্দিন জীবনে লোকখাদ্যের প্রাধান্য দেখা যায়। তার মধ্যে অন্যতম হাতে তৈরি জনপ্রিয় খেজুর গুড় ও প্রিয় পানীয় খেজুর রস। চলচ্চিত্রের শুরুতে দেখা যায় একটি ছোট শিশু রসের মোহে শীত ভোরের পরোয়ানা করে ছুটে চলে বাদাবন ছাড়িয়ে খেজুর গাছের দিকে। যেখানে স্বল্পবাস পরিহিত মতি(অমিতাভ) গাছ থেকে রস সংগ্রহে ব্যাপ্ত। বঙ্গীয় সমাজে খেজুর রস ও গুড়ের উৎপাদন ও ব্যবহার বহুদিন ধরে পরম্পরাগত পদ্ধতিতে চলে আসছে, তাই খেজুর রস ও গুড় লোকসমাজের কাছে অত্যন্ত উপাদেয়। বাঙালীর গার্হস্থ্য ব্রত-পার্বণ, পুজায় গুড় ব্যবহৃত হয়। যথা- নারায়ন পূজার সিন্নিতে, সরস্বতী পূজার দধিকর্মায়, নবান্নের পরমান্ন উৎসবে খেজুর গুড়ের জুড়ি মেলা ভার। কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ফুটে ওঠে খেজুর রসের গুণগান,-"হায়রে শিশির তোরে কি লিখিব যশ/ কাল গুনে অপরূপ কাঠে হয় রস।/ পরিপূর্ণ সুধা বিন্দু খেজুরের কাঠে/ কাঠ কেটে উঠে রস যত কাঠ কাটে"।।

কৃষি> কালটিভেশন> কৃষ্টি> কালচার- এই চারটি শব্দের ভিতর শব্দতাত্ত্বিক ও ব্যুৎপত্তিগত মিল যে রয়েছে তা সকলের জ্ঞাত। প্রকৃতির রাজ্য হল জল, মাটি, আগুনের উপাখ্যান। বাংলার কৃষি জীবনই মূল জীবনস্রোত। এই স্রোতধারার মধ্যে দিয়ে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রবহমান। মানব জাতি 'শ্রম ও কর্ম' কে অবলম্বন করে সভ্যতার ভীত ও সোপান রচনা করেছে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন করে চলেছে। কবি গুরুর ভাষায় 'ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে, মাঠে ঘাটে'- এই শ্রমজীবী মানব সমাজের অন্যতম প্রতিভূ রূপে চলচ্চিত্রে ও আলোচ্য প্রবন্ধে 'শিউলি বা গাছি' শ্রেণী ও তাদের লোকশিল্প, সংস্কৃতি ও সংগ্রামী জীবনশৈলী তুলে ধরার প্রয়াস। সংস্কৃত 'শেফালি' শব্দ থেকে প্রাকৃতে 'সেহলি' শব্দটি বাংলায় 'শিউলি' হয়েছে। 'শিউলি' হল তারাই যারা কায়িক শ্রম দিয়ে খেজুর গাছ কেটে রস সংগ্রহ করে। অনেক গবেষক তাদেরকে 'বিশেষ জাতি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪]

'শিউলি' একটি বিশেষ বৃত্তি বা পেশার নাম। 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে শিউলি মোতালেফ ওরফে মতি মিয়াঁ বহন করছে মেহনতি, কঠোর পরিশ্রমী, কায়িক শ্রমজীবী মানুষের পরিচয়। শিউলি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এর শিকড় ভূমি নিম্নগাঙ্গেয় ভূখণ্ডের দারিদ্র সীমা চিহ্নিত অতিসাধারন প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে। রাষ্ট্র অনুমোদিত ও স্বীকৃত জনজাতি গোষ্ঠীর সূচীর মধ্যে প্রকাশ পায় 'বাগদী' ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলিম জনজাতির। অনুমিত বাগদী সম্প্রদায় এর মানুষের হাত ধরে শিউলি বৃত্তি বা পেশার সূচনা। এই কায়িক শ্রমজীবী শ্রেণী গ্রাম বাংলার মাঠে-ঘাটে শিউলি বা গাছি নামে পরিচিত। সমাজ ও সময়ের পরিবর্তিত বিকাশের প্রবহমানতায় এবং জীবন জীবিকার তাগিদে অন্যান্য অন্ত্যজ প্রান্তিক নিম্নশ্রেণীর মানুষ (হিন্দু ও মুসলিম) এই পেশার সাথে যুক্ত হয়। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য ও প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলার সুপ্রাচীন

ভূখণ্ডের অন্যতম স্থান পুণ্ড্রবর্ধন এবং একদা এই ভূমিভাগে স্ব-মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিল শিউলি সম্প্রদায়।[৫] পূর্ববঙ্গে এদের 'গাছি'ও বলে।

সমস্ত জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হল খাদ্য। খাদ্যের জন্য মানুষ বিভিন্ন বৈচিত্রপূর্ণ পেশায় লিপ্ত হয়। সেই রকমই একধরনের পেশার নাম হল 'শিউলি'। শিউলি বৃত্তি বা পেশা গ্রামীণ লোকসমাজ জীবনের আর্থিক অনটন মোচনের নতুন দিশা হিসাবে সমাজের অন্যান্য অন্তজ সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করায় এই বৃত্তি বা পেশা ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলান্তরে। তাই 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে যে 'হাট' চিত্র ফুটে ওঠে সেটি বিশেষত ছিল আঞ্চলিক গুড় ও পাটালির হাট। বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে ও রাঢ়বঙ্গে মুণ্ডা, মাল, বাউরি, হাঁড়ি, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তফসিলি জাতি, উপজাতির মধ্যে এই পেশা প্রসারিত হয়। এক বৃহত্তর শিউলি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে সামগ্রিক বঙ্গের গ্রামীণ লোক-সমাজ, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।[৬] আধুনিক সামাজিক ও সংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদরা অন্ত্যজ শ্রেণীর এই লোকসংস্কৃতিকে 'primitive culture' বলেছেন। 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে তার জ্বলন্ত প্রতিফলন পরিলক্ষিত। তাদের কাছে 'Culture' শব্দটি সামগ্রিকভাবে 'Way of Life' বুঝায়।

সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতের ইতিহাসে খেজুর গুড় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচীন সাহিত্য ঋকবেদে প্রথম সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা গাছের রস থেকে সৃষ্ট। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বঙ্গসমাজের শূদ্র জাতিকে মহাল বা শিউলি বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, গ্রিকবীর আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ কালে (খ্রিঃ পূর্ব ৩২৬ অব্দে) খেজুর গুড় আস্বাদনে প্রীত হয়েছিলেন[৭]। বাংলায় পাল ও সেন শাসনকালে খেজুর গুড়ের বিশেষ কদর ছিল। মধ্যযুগীয় সাহিত্য সমূহ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, কৃত্তিবাসের রামায়নে, বিপ্রদাস পিপ্লাই এর মনসামঙ্গলে, বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতিতে খেজুর গুড়, গুড়জাত মিষ্টান্ন, পিঠে-পুলিরস, পায়েস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে বঙ্গের গুড় বিদেশের বাজারে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মেদিনিপুরের নন্দীগ্রাম, খেজুরি, বর্ধমান কাটোয়ার খাজুরডিহি গ্রাম; নদীয়ার কল্যাণী; মুর্শিদাবাদের পলাশী; নিম্নবঙ্গের জয়নগর, মগরাহাট, ক্যানিং, মন্দিরবাজার, কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়দিঘি, বনগাঁ, বারাসাত, বসিরহাট, ডায়মন্ডহারবার প্রভৃতি এলাকার গুড় একসময় তমলুক বন্দরের মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হত। চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান গুড় বা পাটালির হাটে ক্রয় বিক্রয় চিত্র ও জনপ্রিয়তা এবং 'মতিমিয়াঁ' নতুন বিবাহের সম্মন্ধে কথা বলতে 'ফুলবানুর' পিতার বাড়িতে উপঢৌকন স্বরূপ গুড়-পাটালি উপস্থাপন বেশ সময়ের প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ।

বঙ্গ তথা বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 'শারদোৎসব' এর সমাপ্তি থেকে গুটি গুটি পায়ে শীত ঋতুর আগমন ঘটে। এই সময় (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ন, পৌষ ও মাঘ) চারমাস ব্যাপী শিউলি সমাজ খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ এবং গুড়, পাটালি তৈরিতে ব্যাতিব্যাস্ত হয়ে পড়ে। শিউলি সমাজের অধিকাংশই বংশ পরম্পরায় গাছকাটা বা গুড় তৈরির কাজে যুক্ত। 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে এই বিশেষ সময়কে পরিচালক বেশ নিপুন ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত আছে জাতসুত্রে বাহিত মেধা শক্তি, ঐতিহ্য, দক্ষতা ও অর্জিত কৌশল বা পদ্ধতি। এই অন্ত্যজ শ্রেণীর বেশীরভাগ মানুষের নিজস্ব গাছ না থাকায় তারা বেড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গাছের সন্ধানে, এবং অপরের জমির গাছ কেটে তাদের চিরায়ত

পেশাকে আঁকড়ে ধরে থাকে জীবন জীবিকার তাগিদে।[৮] চলচ্চিত্রে দেখা যায় মতি মিয়াঁ আঞ্চলিক মহাজন ও ভূস্বামীদের কাছ থেকে কয়েক মাসের জন্য খেজুর গাছ ঠিকা নিচ্ছেন। এখানে মতি মিয়াঁ অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে পর্দায় উপস্থিত। কিছুক্ষেত্রে শিউলিরা শীতের মরসুমে তিন চার মাস ঘর বাড়ি ছেড়ে স্ত্রী-সন্তানসহ খেজুর গাছ অধ্যুষিত সরকারি খাস জমিতে, নদীর চরে অস্থায়ী কুঠির ও বানশাল পাতে। আজকের দুর্মূল্যের বাজারে তাদের আর্থিক অনটন চোখ টানে। এই নিদারুন চিত্র হিন্দি সিনেমায় পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'সওদাগর' চলচ্চিত্রে ফুটে ওঠে।

বঙ্গের শিউলি সমাজে বিশেষ সংস্কার ও লোকাচার পরিলক্ষিত হয়। শিউলি বৃত্তিজীবী মানুষদের কাছে লৌকিক খেজুর গাছের দেবতা হিসেবে পূজিত শনি দেবতা এবং ফরিদ সাহেব। শীতের মরসুমে নতুন গাছ ধরা বা মুড়া দেওয়ার আগে প্রত্যেক শিউলি তাদের ভক্তি ও বিশ্বাস থেকে লৌকিক দেবতার আশীর্বাদ পেতে বিশেষ পূজা ও মানত করে থাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষার জন্য। এছাড়া নতুন উনান বা বানশাল তৈরি করতে বাস্তুদেবতার পূজা দিয়ে তবেই মাটি খোঁড়ে। এরপর গাছের প্রথম রস থেকে সৃষ্ট অমৃতস্য গুড় বানশালে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয় এবং নতুন মেটে ভাঁড়ে গুড় তুলে তারপর পাটালি তৈরি হয়। এই প্রথম পাটালি স্থানীয় দেব-দেবীর থানে বা মন্দিরে (পীর, গাজী, বিবিমা, বুড়োমা, শনিদেবতা, শীতলাদেবী, মনসাদেবী, চণ্ডীদেবী, দক্ষিণরায় প্রভৃতি) হাজত হিসেবে পূজিত হয়। এক্ষেত্রে বাড়ির মহিলারা শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় স্নান সেরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানে রস জ্বাল, গুড়ধরা, পাটালি তৈরি প্রভৃতি কায়িক শ্রম কাজে নিজেদের নিয়োগ করে এবং চলচ্চিত্রে 'মাঝুবি' একাগ্রচিত্তে এই দক্ষতা ফুটিয়ে তুলেছে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাদের এই শুদ্ধ বিশ্বাস চিরায়তকাল থেকে প্রবহমান আজকের শিউলি সমাজে।

প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যাতিরেকে শিউলিরা (নিরক্ষর) কিভাবে নিচ থেকে উপরে উঠতে হয় জানে (খেজুর গাছে)। তারা তাদের মেধাজাত দক্ষতায় অনায়াস ভঙ্গিতে চারি হাত পায়ের অপূর্ব শৈল্পিক মেলবন্ধনে দিনের বিশেষ ভাগে 'সায়াহ্নে' বা সূর্যাস্তকালেও 'আলো-আঁধারী ভোরে' বা প্রাক-সূর্যোদয়কালে গাছে ওঠেন। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে, মেজাজি শীতকে অগ্রাহ্য করে সল্পবাস পরিহিত শিউলি জীবন ও জীবিকার তাগিদে কঠোর শ্রমের মধ্যে দিয়ে খেজুর গাছকে সযত্নে লালিত পালিত করে অমৃত কুম্ভের সন্ধানে। এই দৃশ্য সওদাগর চলচ্চিত্রে মতি মিয়াঁ তাঁর অভিনয় দক্ষতায় নিখুঁত ছাপ রেখেছেন। এই মরশুমি পেশাতে মতি শিউলির গাছে উঠতে ব্যবহৃত ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমূহের বর্ণনা দিলাম, প্রথমে মালকোঁচা ছোট লুঙ্গি বা খদ্দরের আন্ডার প্যান্ট এবং গামছা পরেন, তার উপর পাটের ছোট বস্তা 'জোত' বা দড়ি দিয়ে বাঁধেন – যা শিউলির কোমরে ব্যথা বা লাগা থেকে রক্ষা করে। মাথায় গামছা বাঁধেন – যা গাছের ময়লা, পোকামাকড়, মৌমাছি থেকে রক্ষা করে। কোমরে বাঁধা বাঁশের আঁটাতে বা হুকে 'গলাস' সহ 'ডাবরি' বা 'ভাঁড়' ঝুলিয়ে নেন। দুপায়ে 'পাউটা' বা দড়ি সড়পা লাগান – যা গাছে দ্রুত উঠতে সাহায্য করে। কোমরবন্ধ তলপিতে 'ঝড়োদা' বা লম্বা ধারালো অস্ত্র থাকে দুটি-একটি গাছ ছাড়াতে, স্তর বানাতে এবং অন্যটি চাঁচ দেওয়া বা কাট দেওয়ার কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়। বিশেষ কাজে লাগে বেশনি বাঁশের কঞ্চির অর্ধাংশ মসৃণ ছোটনলি, যেটি গাছ থেকে রস নির্গমনের প্রধান ও অন্যতম পথ। একটি বেশ শক্ত মোটা দীর্ঘ 'পাটের কাছি'-যা সমস্ত শরীরের ভার বহন করে এবং এর দ্বারা গাছের নির্দিষ্ট অংশে পৌঁছে যান। নিজ অভিজ্ঞতার কেতাবি ডঙে গাছ 'মুড়া' দিয়ে, 'চাঁচ' দিয়ে, 'নলী'

দিয়ে, 'গোঁজ' পুঁতে, 'ভাঁড়' পেতে রস সংগ্রহ পদ্ধতির পরিপূর্ণ রূপ দেন। এইভাবে দীর্ঘ কায়িকশ্রম দিয়ে প্রত্যহ ৫০-১০০ টি গাছ আরোহণ করে রস সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু এই সময় ও শ্রমের সঠিক মুল্য থেকে তারা সর্বদাই বঞ্চিত, যা চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত।

শিউলি সমাজে মেহনতি নারীর ভূমিকা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, সেই বলিষ্ঠ চরিত্রে মাঝুবি অভিনয়ে অনন্যা। চলচ্চিত্রে মাঝুবি গুড়-পাটালি শিল্পের অর্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজমান প্রজ্বলিত চন্দ্র-সূর্যরূপে। এই প্রাকৃতিক রূপকের আড়ালে থাকে অন্তর্নিহিত কর্ম নৈপুণ্যচিত্র। এই সমাজ ও শিল্পে পবিত্রতা ও শুদ্ধতা হল প্রধান মার্গ। শীতের মরশুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাজে শিউলি বাড়ির মহিলারা কঠোর শ্রমী, ব্যস্ততম, সংযমী, হস্তকুশলী পূর্ণজীবনে নিমজ্জিত থাকে। প্রথম পর্যায়ে শিউলির সাথে শিউলি স্ত্রীরা 'বান' বা 'শাল' তৈরি করে তাদের হাতের মরমি যাদুতে, সমগ্র স্থানটি গোবর-মাটি লেপে দিয়ে বাস্তুপূজার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে তোলে। উনান বা গাড়ার চারিদিকে জ্বালানির কাঠ (খেজুর গাছের ডেগো, পাতা, হোগলা, গোলপাতা, তালডেগপাতা, চুয়ুর, পাটকাটি, খড়) মজুত করে রাখে। দ্বিতীয় পর্যায়ে খেজুরগাছে পাতার বা ঝোলানোর জন্য ডাবরি বা ভাঁড়ের পরিচর্যা। শিউলি মেয়েরা নতুন ও পুরানো ডাবরিগুলো খড়ের বা খেজুরের চুয়ুর দিয়ে মেজে-ঘষে পরিষ্কার করে এবং জল দিয়ে ধুয়ে রোদে রাখে শুষ্ক করতে। তারপর সিক্ত খড়, খেজুরপাতা পুড়িয়ে কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়ার সৃষ্টি (মহাদেবের জটার ন্যায়) করে ভাঁড়গুলিকে ঐ আগুন ও ধোঁয়াদ্বারা আভ্যন্তরীণ গন্ধ ও জীবাণুমুক্ত করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ে শিউলিরা 'বালি চ্যাঁরা' (সুপারি গাছের শক্ত মসৃণ বাকল) এর সাহায্যে 'হাঁসুয়া' বা 'কাঠারিদা' বা 'ঝড়োদা' গুলি ধারালো করে, এক্ষেত্রে শুদ্ধ ও মিহিবালির যোগান দেন মেয়েরা। এরপর বাঁশের তৈরি 'বাঁকি'তে ভাঁড়সমূহ সাজাতে মেয়েরা সাহায্য করে। চতুর্থ পর্যায়ে শিউলি গাছি সজ্জায় সজ্জিত হয়ে মুখে সুখানুভূতি বিড়ির টান বা গাঁজার কলকেতে টান বা গড়গড়াতে টান দিয়ে অপরাহ্নের পড়ন্ত বিকালে মাথায় কেরোসিনের 'টোম' বা 'লম্প' (মেয়েদের তৈরি গ্রামীণ বাতি) বেঁধে চলে গন্তব্যের দিকে। পঞ্চম পর্যায়ে খেজুর গাছে উঠে চাঁচ দিয়ে ভাঁড় বেঁধে নেমে আসে এবং সন্ধ্যার জোনাকির আলো, ঝিঁঝিঁডাক শিউলিকে পথ দেখায় ও শোধায় বাড়ি ফিরতে।

কনকনে শীতে লেপের পরশে শিউলি দম্পতির (মতি ও মাঝুবি) অচেতন মনে সচেতন ভাবনাগুলি আবর্তিত হয় খেজুর গাছকে কেন্দ্র করে। ষষ্টপর্যায়ে শীতকে উপেক্ষা করে সূর্যোদয়ের পূর্বে শিউলি 'গাছি' সজ্জায় সজ্জিত হয়ে খালি ভাঁড়সহ বাঁকি নিয়ে রস সংগ্রহে ছুটে চলে আলো আঁধারি মেঠো পথ ধরে খেজুর বৃক্ষ প্রান্তরে। প্রতিটি বৃক্ষ থেকে খেজুররস সংগ্রহ করে পুনরায় ভাঁড় পেতে দিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে পল্লীর আনাচে কানাচে প্রচলিত বাউল গান ভেসে ওঠে শিউলিদের মুখে মুখে, "খেজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মন/ নইলে রস গড়িয়ে গোড়া পচে/ অকালে হবে মরণ।....." প্রান্তিক বিপদসঙ্কুল উপেক্ষা করে পরিপূর্ণ রস ভাঁড় (ডাবরি মুখে খেজুর পাতা গুঁজে) নিয়ে ফেরে বানশালে। উনান জ্বালিয়ে শিউলি রমণী মাঝুবি পথের দিকে তাকিয়ে থাকে তাঁর আসার অপেক্ষায়। সপ্তম পর্যায়ে শিউলি ফেরে বানশালে এবং 'চুয়ুর' বা ছাঁকনির সাহায্যে বানে বসানো মাটির বৃহৎ খুলি বা সালতি বা টিনের নৌকাতে রস ঢালা হয়। এই শীতের কুয়াশামাখা ভোরে বানশালে রস আস্বাদন করার স্বর্গীয় অনুভূতি একমাত্র তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা এই অমৃত সেবনে ভাগ্যবান।[৯]

শিউলি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন প্রকার রস সংগ্রহের পর তা থেকে গুড় তৈরিতে প্রধান ভূমিকা নেন শিউলি রমণীরা। পরিচালক তার সুনিপুণ কৌশলে দেখান গুড়শিল্পের দক্ষ রমণী 'মাঝুবি' ও অদক্ষ 'ফুলবানু'কে। এখানেই গল্পের প্রধান নাটকীয় চিত্র দর্শককে নতুন করে ভাবতে শেখায় শিল্পীর শিল্পসত্তাকে মর্যাদা দিতে। অষ্টম পর্যায়, শিউলি ঘরণীরা অগ্নিকুণ্ডের বান জ্বাল দিতে দিতে কালিমালিপ্ত হয়ে রসকে গুড়ে পরিণত করে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত (প্রায় ৪-৫ ঘণ্টা)। এই গুড় ৫ থেকে ৭ বার 'বাগাফোট' অর্থাৎ ফোটার পর পরিণত হয় নলেনগুড়ে। তারপর 'ওরাং' বা উড়কিমালার সাহায্যে নির্দিষ্ট পাত্রে সঞ্চিত রাখা হয়। এটি নলেনগুড় হিসেবে প্রসিদ্ধ। এরপর 'ভাদালি' বা সাদাবস্ত্রের উপর নির্দিষ্ট মাপে গুড় জমিয়ে বা ঠাণ্ডা করে পাটালি তৈরি করা হয়। রস ফুটিয়ে সুগন্ধি ও সুস্বাদু গুড়ে পরিণত করতে শুষ্কপাতা ও বিভিন্ন কাঠের সাহায্য নিলেও তাদের প্রধান শুষ্ক উপাদান 'ত্রয়ীকাষ্ঠ' হল নিমকাঠ, বেলকাঠ ও আমকাঠ। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কয়েকটি 'বানশাল' চাক্ষূষ প্রত্যক্ষের সুযোগ মেলে যথা, রসিক কালার বানশাল(দুলালপুর), মনি মণ্ডলের বানশাল(রায়নগর), কার্ত্তিক মাঝির বানশাল(কাঁটাখালি), শিউলিপাড়ার বানশাল(তাঁতিহাটি) প্রভৃতি। এছাড়া জ্ঞাত হলাম, অমৃতস্য গুড়ের চাবিকাটি হল ওই ত্রয়ী কাঠ, যা দিয়ে রস জ্বাল দিলে উৎপাদিত গুড় অবশ্যই অত্যন্ত মিষ্ট ও সুবাসিত হয়।

শিউলিরা গুড়ের প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন, যথা- ক) নলেনগুড় বা মৌঝোলা গুড় অর্থাৎ গাছের প্রথম বা নতুন গুড়। এটি বেশ মিষ্টি হয় এবং এরদ্বারা নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা, মোয়া ও অন্যান্য মিষ্টান্ন হয়। খ) জিরেনকাট গুড় বা দানাগুড় অর্থাৎ গাছকে কয়েকদিন বিশ্রাম দিয়ে কাটার পর যে গুড় তৈরি হয়। এটি অতিসুস্বাদু এবং অতুলনীয়। এরদ্বারা পরমান্ন, পায়েস, পাটালি, ক্ষীরভাত তৈরি হয়। গ) পাটালি গুড় বা কড়াপাকের গুড় যা উন্নতমানের হয়। এই গুড় তৈরি পদ্ধতি বেশ ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় জ্ঞান দ্বারা শিউলি রমণীরা করে থাকে। ঘ) মরশুমি শেষের ঝোলাগুড় বা দোকাগুড়। এটি দিবাভাগে বা দু-একদিন ধরে গাছ ভাঁড়ে যে রস সঞ্চিত হয় তা থেকে তৈরি গুড়। এই গুড়ের মিষ্টত্ব কম, এটি পাতলা ও পানসে হয় এবং চাহিদাও কম। এই গুড় গোখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঙ) এছাড়া দু-তিনদিনের গাঁজানো রস যা বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'তাড়ি' পানীয়রূপে অন্তজশ্রেণী বিশেষের কাছে সমাদৃত। তা উৎবৃত্ত হলে যে নিম্নমানের গুড় তৈরি হয় তা ওলাগুড় বা নিকমগুড় হিসেবে পরিচিত। নিম্নশ্রেণীর আর্থিক অনটনে 'সস্তায় পুষ্টিকর খাদ্যরূপে' এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। চলচ্চিত্রে দেখা যায় মতির 'গুড়-পাটালি' কদর তুঙ্গে 'গ্রাম-গঞ্জে-হাটে', যদিও সেটি মতির প্রথম স্ত্রী মাঝুবির হস্ত যাদুতে তৈরি। কিন্তু সময়ের ফেরে মাঝুবিকে তালাক দিয়ে ফুলবানুকে বিয়ে করলে আনকোরা, অনভিজ্ঞ হাতে মতির রসের গুড়ের বিশেষ বদনাম হয়। পরিচালক এখানে জাত শিল্পীর আত্মপরিচয়কে বিক্রি হতে দেননি। সমাপ্তিতে তাই দেখিয়েছেন শিল্প ও শিল্পী কোথায় যেন একাকার হয়ে গেছে আমাদের গ্রামীণ লোক সমাজের বাস্তবতায়।

কিন্তু বর্তমানে পল্লীর অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের মতো এই গুড় শিল্পের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ শোচনীয়। এক কলসি বা ভাঁড় গুড় তৈরি করতে একটি শিউলি পরিবারের যে পরিমান সময় ও শ্রম ব্যায়িত হয় তার নুন্যতম মুল্য তাদের ট্যাঁকে আসেনা। কারন মধ্যসত্বভোগী ব্যবসায়ী শ্রেণীর কৌশল ও মুনাফা লাভে চতুরতা অজ্ঞ শিউলিদের ঠকাতে বেগ পেতে হয়না। তার উপর এই মাত্র চার মাসের হাড়ভাঙা খাটনির ব্যবসার পর যেটুকু অর্থ শিউলির ঘরে আসে তার একটি অংশ দিতে হয় খেজুর গাছ মালিক দের।

চলচ্চিত্রে উক্ত চিত্র পরিচালক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের আর্থিক দুরাবস্থা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে, এমনকি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছেড়ে সভ্যসমাজে তারা আজও ব্রাত্য। তারা বিভিন্ন কৃষিকাজ, গবাদি পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, হস্তশিল্প এর সাথে যুক্ত থাকে। আসলে ভারতবর্ষের সামাজিক কাঠামোয় বরাবরই পরিশ্রমসাধ্য পেশার সাথে যুক্ত মানুষের কপালে জুটেছে সমাজের অবহেলা ও লাঞ্ছনা।[১০]

মুল্যায়ন

শিউলিজাতি এখন আর নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছেনা, বরং বঙ্গ থেকে এজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। সমাজের এই অন্ত্যজশ্রেণী কেবল তাদের বৃত্তি বা পেশাকেই মূল জীবিকা হিসেবে ধরে রেখে বহু অতীতকাল থেকে বেঁচেছিল। আমাদের সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনা, আমরা যে যুগে বাস করছি তার নাম বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজ। বিজ্ঞানের এমন উৎকর্ষ, শ্রমের এমন নিপুণ প্রয়োগ এবং সম্পদের এমন বিপুল বৈভব আমাদের পূর্বপুরুষেরা কখনো কল্পনা করতে পারতেন না, সেদিক থেকে বোধহয় আমরা সৌভাগ্যবান। কিন্তু সম্পদের এই ব্যাপক আয়োজন, ঐশ্বর্যের ঢক্কানিনাদ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিদারুন আত্মঘোষণার পাশাপাশি বঙ্গসংস্কৃতির বৃহৎ প্রান্তিক মানব গোষ্ঠীর করুন চিত্র প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত হয়। এতে দেশ সমাজ ও জাতির প্রভূত উন্নতি ঘটছে ঠিকই কিন্তু বিশেষত বঙ্গসমাজ থেকে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের (শিউলি) হস্তজাদুতে তৈরি শিল্প সৌন্দর্যসাধনা, মেধাশক্তি আজ অস্তাচলের পথে ধাবমান। তাদের পরিবারের আজকের সন্তানরা পূর্বপুরুষদের জাতি বৃত্তি বা জীবিকা কি ছিল তা অজ্ঞাত। এরই পশ্চাতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বিশ্বায়িত বানিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধি ও মুনাফা-লোলুপতা। একটি জাতির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তার আদিম জাতিগত বৃত্তি বা পেশা যদি বিলুপ্তির পথে থাকে এবং জীবনধারনের কোন বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জাতিটি কতদিন টিকে থাকবে? ক্রমশ লুপ্ত হতে হতে একদিন শিউলি জাতির অস্তিত্ব লোকসংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাবে।[১১] তাদের টিকে থাকার জন্যে দরকার সরকারী পৃষ্টপোষকতা, অনুদান ও সহযোগিতা।

তথ্যসূত্র:

১। Kosambi, D.D – Myth and Realit : Studies in the Formation of Indian Culture, Bombay; Popular Publication, 1962, P-2.

২। Chattopadhaya, D. -'Lokayata', New Delhi, Paper Publishing House, 1959, P-xix.

৩। ভট্টাচার্য, আশুতোষ – বাংলার লোক সংস্কৃতি, ন্যশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ১৯৮২, পৃষ্ঠা- ১৩

৪। রায়, তরুণকুমার–লোকায়নচর্চার ভূমিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ১৯৯৫,পৃষ্ঠা- ৯৪

৫। রায়, নীহাররঞ্জন – বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা- ১২৬

৬। মজুমদার, রমেশচন্দ্র – বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা- ১৭

৭। মণ্ডল, কাকলি ধারা - নলেন গুর ও শিউলি সমাজ, ট্র্যাডিশন পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রকাশ মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৩

৮। জানা, সৌমেন -'লোকসংস্কৃতি : তত্ত্বজিজ্ঞাসা', তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৪৪

৯। মণ্ডল, কাকলিধারা – নলেন গুড় ও শিউলি সমাজ, ট্র্যাডিশন পাবলিকেশন, কলকাতা, মার্চ ২০১২, পৃষ্ঠা- ১৭

পত্র-পত্রিকা:

১০। নিজস্ব সংবাদদাতা, শিউলির দেখা নেই, আকাল নলেন গুড়ের', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্র, নগরায়নের কোপে খেজুর গুড় উৎপাদনও', এইসময় সংবাদপত্র, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৩